গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৫ সংখ্যা | ২৫ নভেম্বর - ১ ডিসেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

পাশের হার বাড়লেও কিছু শিখছে না বিরাট সংখ্যক ছাত্র

বলছে সরকারি সমীক্ষাই

স্কুল স্তরে পাশ-ফেল প্রথা না থাকলে শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান পরিকাঠামোয় বেশিরভাগ ছাত্র যে কিছুই শেখে না, এই সত্য বহুবার তুলে ধরেছেন অসংখ্য শিক্ষাবিদ। রাজনৈতিক দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন করে গেছে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার দাবিতে। আন্দোলনের চাপে কিছুটা হলেও পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনতে সরকার বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবার রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ঢালাও নম্বর দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। তা নিয়ে শিক্ষাবিদরা উদ্বিগ্ন। কারণ এর ফলে মার খাবে শিক্ষার মান। এই উদ্বেগ যে কতটা সত্য, এবার সরকারি সমীক্ষাতেও তা উঠে এল।

ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন (ইউডিআইএসই)-এর করা সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ২০১৬-'১৭-এর পর থেকে ২০২১-'২২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিকস্তরে ধারাবাহিকভাবে পাশের হার বেড়েছে। জেনারেল ক্যাটিগরির ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি, এসসি, এসটি, ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর পাশের হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ওই সময়ে একই ক্লাসে থেকে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেছে। মাত্র ১ শতাংশের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী পরপর দু-বছর একই ক্লাসে থেকেছে।

সরকারি নেতামন্ত্রীরা প্রচার করবেন, এটি একটি অগ্রগতি। কিন্তু সেই সঙ্গে অপর একটি সমীক্ষা রিপোর্ট দেখাচ্ছে, ২০১৭-১৮-র তুলনায় ২০২১-২২

পাঁচের পাতায় দেখুন

এ কেমন গুজরাট বানিয়েছেন মোদিজি!

ডিসেম্বরে দু'দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচন। গত ২৭ বছর ধরে সেখানে সরকারি ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। রাজ্যে সরকারে বসার পর থেকেই বিজেপি উন্নয়নের 'গুজরাট মডেল' নিয়ে বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে চলেছে। অথচ গত কয়েকমাস ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কার্যত পড়ে থাকতে হচ্ছে গুজরাটের মাটি কামড়ে। তাঁকে প্রচারের সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনও হিমাচল প্রদেশের ভোট ঘোষণার পর বেশ কিছু দিন সময় নিয়ে গুজরাটের ভোট ঘোষণা করেছে। গত দু-তিন মাসে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে যত প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন, তার তালিকা বিরাট লম্বা। সারা বছর ফাঁকি দিয়ে টেস্টের পর বই খুলে বসা ছাত্রের মতো তাঁর দশা। নরেন্দ্র মোদি তা জানেন বলেই পুরনো মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে ৪২ জন এমএলএ-কে প্রার্থী তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলেছেন। দেখানোর চেষ্টা করছেন এবার যেন নতুন বিজেপি! রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে সকল ক্ষোভ চাপা দিতে তিনি বলে চলেছেন 'এই গুজরাট আমি বানিয়েছি'।

কেমন বানিয়েছেন তিনি এবং তাঁর দল গুজরাটকে?

সারা দেশেই আজ বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে মানুষ। গুজরাট তার ব্যতিক্রম নয়। 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটে' ভোট প্রচারে প্রার্থীরা গেলেই মানুষ তাঁর বাসস্থান এলাকার নোংরা পরিবেশ, নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ জানাচ্ছেন। জানাচ্ছেন আলোহীন রাস্তাঘাট ও সেখানে অবাধে চরতে থাকা গবাদি পশুর কারণে ভোগান্তির কথা। কয়েকদিন আগেই ঘটে গেছে মোরবি সেতুর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃত্যু হয়েছে ১৪১ জনের। দিনের পর দিন কেটে গেলেও ব্রিজটির নির্মাতা সংস্থার মালিককে গ্রেফতার করেনি গুজরাট পুলিশ। তা নিয়েও ক্ষোভ জানাচ্ছেন মানুষ। নিত্যদিনের অজস্র সমস্যায় এমন ভাবে জেরবার হয়ে রয়েছেন তাঁরা যে, অধিকাংশেরই যেন এ সবের বাইরে আর কিছু ভাবারই ফুরসৎ নেই! জীবনযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁদের সামনে নগ্ন হয়ে যাচ্ছে 'গুজরাট মডেল'-এর বীভৎস চেহারা।

মূল্যবৃদ্ধি ঃ গোটা দেশের মতো গুজরাটের মানুষও মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে। গত কুড়ি বছরে রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম চারশো শতাংশ বেড়ে গেছে। রাজ্যের বিজেপি সরকার চাইলে এই চরম মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এমন নয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বিষয়ে তাদের কোনও সদিচ্ছা দেখা যায়নি। ভোটের মুখে

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরাখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য জয় এ আই ডি এস ও-র

উত্তরাখণ্ডের হেমবতী নন্দন বহুগুণা গাড়োয়াল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য জয় পেল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড রঞ্জনা। তিনি ৩২০৭টি ভোট পেয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ২০৫০ ভোটে হারিয়েছেন। কমরেড মনিকা চৌহান গার্লস রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ছাত্রদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে এআইডিএসও-র ভূমিকা অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। অন্যেরা যখন ক্যাম্পাসের পরিবেশ, শিক্ষার সমস্যা, ছাত্রদের দাবি নিয়ে সরব হওয়ার বদলে টাকার জোরে, গায়ের জোরে কিছু সিট দখল করতে ব্যস্ত থেকেছে, এআইডিএসও সেখানে নিয়মিত ক্লাস, ক্যাম্পাসে ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, হস্টেলে সুলভে ভাল মানের খাবার দেওয়া, বন্ধ ক্যান্টিন চালু করার মতো একগুচ্ছ দাবি নিয়ে লড়েছে।

এআইডিএসও-র জয়ের পর উচ্ছ্বসিত ছাত্রছাত্রীরা

সমস্ত স্তরে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। এআইডিএসও-র এই ভূমিকা, সংগঠনের বক্তব্য এবং নির্বাচন পর্বে তাদের প্রচার কর্মসূচি শুধু ছাত্রদের মধ্যেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শহরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও আশার সঞ্চার করেছে।

এআইডিএসও-র এই জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে ২০ নভেম্বর গাড়োয়ালের নাগরিকরা একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও-র গাড়োয়াল জেলা সভাপতি কুলদীপ বাঘেলা। ছাত্র আন্দোলনে এবং জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এআইডিএসও-র ভূমিকার প্রশংসা করে সভায় বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের নেতা অনিল স্বামী, বিএসএনএল কর্মী ইউনিয়নের সহসভাপতি পি বি ডোভাল, সমাজকর্মী পি বাবুল কার্জি। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের উত্তরাখণ্ড রাজ্য কনভেনর কমরেড মুকেশ সেমওয়াল এই জয় প্রসঙ্গে বলেন— সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের বিশ্বস্ত শক্তি হিসাবে মানুষ একমাত্র এআইডিএসও-কেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই এই জয়, ছাত্র-শিক্ষক এবং সমস্ত শিক্ষানুরাগী মানুষের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি আস্থা ও আশা জাগিয়ে তুলেছে। জয়ী এআইডিএসও প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদকে লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত করে ছাত্র সমাজের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন।

এ কেমন গুজরাট বানিয়েছেন মোদিজি!

একের পাতার পর

দাঁড়িয়ে মানুষকে লোভ দেখিয়ে প্রতারিত করতে গত অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এরই সঙ্গে চলছে অন্য দলের এমএলএ এমপি-র অবাধ কেনাবেচা। চলছে ভোটারদের মধ্যে জাতপাত সম্প্রদায় ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করার বিজেপির চিরাচরিত খেলা।

ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা ঃ গুজরাটের যুবসমাজ ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যায় ভুগছে। কোভিড অতিমারির পর অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়েছে। কাজ না পেয়ে গুজরাট রাজ্যে গত দু'বছরে প্রতিদিন প্রায় কুড়ি জন কর্মহীন যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বেকার সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজ্য জুড়ে নানা বিক্ষোভ হয়েছে। গুজরাটের বিজেপি সরকার সেই বিক্ষোভ লাঠি-গুলি দিয়ে বর্বরের মতো দমন করার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী যে ১০ লক্ষ নিয়োগপত্র বিলি করার কথা ঘোষণা করেছেন, তা মিলেছে রাজ্যের মাত্র ৩৭৩ জনের।

শিক্ষার বেহাল দশা ঃ গুজরাটের বিজেপি সরকার শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের নীতি শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করেছে। রাজ্য জুড়ে শিক্ষার মান ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। সরকারি স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা একাধিক সরকারি স্কুলকে জুড়ে দেওয়া রাজ্যের দৈনন্দিন ঘটনা। এর উপর গুজরাটের বিজেপি সরকার এখন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যব্যবসার রমরমা ঃ কোভিড অতিমারি গুজরাটের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভয়ঙ্কর চেহারা বেআব্রু করে দিয়ে গেছে। অতিমারি কালে কোভিড রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দূরের কথা, প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যন্ত সরবরাহ করতে পারেনি গুজরাটের বিজেপি সরকার। এই সময় রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগে অসংখ্য কেলেঙ্কারির ঘটনাও ঘটেছে। এই সরকারের মদতে বেসরকারি হাসপাতালের মালিকরা যেমন খুশি টাকা নিচ্ছে রোগীদের কাছ থেকে। এমনিতেই শিশু মৃত্যুর হার, প্রসূতিদের চিকিৎসা, জনসংখ্যা পিছু হাসাপাতালের বেডের নিরিখে গুজরাট বহু রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার প্রবল অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গুজরাটে বিজেপি সরকার।

মহিলাদের নিরাপত্তা নেই ঃ গত পাঁচ বছরে গুজরাটে ৬ হাজার ৩১৬টি ধর্ষণের ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৭২টি গণধর্ষণের ঘটনা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাস্তবে মহিলাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা এর চেয়ে আরও অনেক গুণ বেশি। সম্প্রতি গুজরাট সরকার যেভাবে বিলকিস বানোর ধর্ষক ও দোষীদের মুক্তি দিল তাতে গোটা দেশে নিন্দার ঝড় উঠে গেছে। শিশু সহ একাধিক খুন ও নারী নির্যাতনের অসংখ্য মামলা বিচারাধীন হয়ে পড়ে রয়েছে মোদিজির 'তৈরি' গুজরাটে। ২০২১-এর শেষে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের উপর নির্যাতনের বিচারাধীন মামলা ৯৬ হাজার ছাড়িয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির যে পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রক প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গোটা দেশের মধ্যে গুজরাটেই কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি। ধন্য মডেল রাজ্য! রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ হলেও প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাবে মদের রমরমায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

শ্রমিকদের অমানবিক পরিস্থিতি ঃ শ্রমিকদের প্রতি রাজ্যের বিজেপি সরকারের আচরণ দেখলে স্পষ্ট হয় যে, শ্রমিকদের এই সরকার মানুষ বলে মনে করে না। দীর্ঘ ২৫ বছর এ রাজ্যে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হয়নি। ২৫ বছর পর যেটুকু বাড়ানো হয়েছে তাও অতি সামান্য। কলে-কারখানায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় যে সমস্ত শ্রমিকের জীবন চলে যাচ্ছে বা যাঁরা আহত হচ্ছেন, তাদের পরিবারের প্রতি কোনও রকম সহানুভূতির চিহ্ন দেখায় না এ রাজ্যের বিজেপি সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমবিরোধী যে লেবার কোড নিয়ে এসেছে গুজরাটে তা ব্যাপকভাবে চালু করে শ্রমিক শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে এখানকার বিজেপি সরকার।

কৃষক সমাজের করুণ দশা ঃ রাজ্যে কৃষকদের অবস্থাও যথেষ্ট করুণ। দিল্লি সীমান্তে দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার জনবিরোধী কৃষি আইনগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও গুজরাটে বিজেপি সরকার অবাধে সেগুলোর ঢালাও প্রয়োগ করে চলেছে।

আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি নেই গুজরাট সরকারের ঃ প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, তাঁর এবিসিডি বর্ণমালাতে প্রথম অক্ষর 'এ' বলতে আদিবাসীদেরই তিনি বোঝান। কিন্তু গুজরাট রাজ্যে আদিবাসী ও দলিত সমাজের মানুষের অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে আজও এঁরা মধ্যযুগীয় অনুন্নত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। সম্প্রতি পার-তাপি-নর্মদা সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রাজ্যের আদিবাসী জেলা ডাঙ প্রবল বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল। প্রথম যখন এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা হয় তখন এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে এলাকার মানুষ জোরদার আন্দোলন চালিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের চাপে প্রকল্পটি ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার নতুন করে ওই প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করলে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন আদিবাসীরা। গুজরাট রাজ্যটিতে দলিত ও আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগতই বেড়ে চলতে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের বিজেপি সরকার যে এই মানুষগুলিকে শুধুমাত্র তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে দেখে, এদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তাদের যে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই— দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে কথা।

সীমাহীন দুর্নীতি ঃ গুজরাটে বিজেপি সরকারের দুর্নীতির গভীরতা কেমন তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে মোরবি সেতু দুর্ঘটনা। আজ বোঝা যাচ্ছে কাটমানির জোরে কোনও নিয়ম মানার তোয়াক্কাই করেনি কনট্রাক্টররা। এই দুর্ঘটনার জন্য অভিযুক্ত বিজেপি এমএলএ-কে জেলে ভরা দূরে থাক সেই জয়সুখ ভাই প্যাটেলকেই বিধানসভার টিকিট দিয়েছে বিজেপি। কোভিডের সময় জাল ভেন্টিলেটর বেচেও ছাড় পেছে গেছে বিজিপি ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা। গত এক বছরে সরকারি দপ্তরে ১৭৩টি দুর্নীতির ঘটনা সামনে এলেও তার তদন্ত কী হল কেউ জানে না। নোট বাতিলের সময় বিজিপি-র প্রাক্তন এমএলএ সচিন ওঝা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা সরকার নেয়নি। গুজরাটের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে কয়েক শত কোটি টাকার দুর্নীতির খবর সামনে এলেও সরকারের হেলদোল নেই।

মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার ভিত্তিতে গুজরাটে এসইউসিআই(সি) দলের কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের এই সুযোগটিকে তাঁরা পচা-গলা সংসদীয় ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটনের কাজে ব্যবহার করছেন। নোংরা, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক আবহের মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়ার সংগ্রাম চালাচ্ছেন তাঁরা। জনসাধারণের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ যে এই মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সেই সত্য তাদের কাছে তুলে ধরছেন কর্মীরা। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের নির্বাচিত করে গণআন্দোলনের শক্তিকে আরও জোরদার করার আবেদন জানাচ্ছেন। রাজ্যের জনবিরোধী বিজেপি সরকারকে পরাজিত করতে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে আহ্বান জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্ব।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অজয় চক্রবর্তী ১০ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

কমরেড অজয় চক্রবর্তী ছাত্রজীবনে সত্তরের দশকে খড়গপুরে থাকাকালীন বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ থেকে প্রথমে সিপিএম-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এআইডিএসও-র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের একটি আলোচনা তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি সিপিএমের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসেন। কিছুদিন পর কর্মসূত্রে কলকাতায় চলে আসেন। তখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছিল। তার মধ্যেই তিনি দলের কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র হয়ে কাজ শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন।

তিনি প্রথমে দলের উল্টোডাঙা-মানিকতলা লোকাল কমিটির অধীনে কাজ শুরু করেন। ওই লোকাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক, রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড বাদল পালের সস্নেহ সাহচর্য কমরেড অজয় চক্রবর্তীকে দলের একজন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠকে পরিণত হওয়ার সংগ্রামে এগিয়ে দেয়।

সেই সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে তাঁর দাদার তীব্র আপত্তিতে তাঁকে বাড়ি ছাড়তে হয়। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি বেলেঘাটাতে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড অরুণা মিশ্রের (মেজদি) বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। মেজদি তাঁর মৃত্যুর সময় ওই বাড়ি দলকে দান করে যান। ওই বাড়িই হয়ে ওঠে বেলেঘাটা পার্টি অফিস, যে বাড়িতে কমরেড অজয় চক্রবর্তী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে গিয়েছেন।

সত্তরের দশকে কংগ্রেস আমলে বেলেঘাটার রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। সিপিএম আমলেও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই পরিস্থিতিতে হাতে গোনা কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই ঝড়ঝাপটার মধ্যেও সাহসের সাথে দলের রাজনীতি নিয়ে তিনি এলাকার ঘরে ঘরে গেছেন। একজন দু'জন করে কর্মী সংগ্রহ করেছেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্য এবং ছোটদের প্রতি গভীর স্নেহ সহজে মানুষকে আকর্ষণ করত। এর মধ্য দিয়ে কমরেড অজয় চক্রবর্তী বহু মানুষের আপনজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দলের কাজেই পুরো সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর জীবনের কোনও কিছুই দলের কাছে গোপন ছিল না। নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের সংগ্রাম তিনি সচেতনভাবে সর্বদা করেছেন।

দল যেখানে যে দায়িত্ব দিয়েছে তিনি তা হাসিমুখে পালন করেছেন। নব্বইয়ের দশক থেকে বেলেঘাটা উল্টোডাঙা এলাকায় তাঁর নেতৃত্বকারী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। কলকাতা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দলের সাংগঠনিক কাজেও তিনি সময় দিয়েছেন।

হাসপাতালের সামনে কমরেড অজয় চক্রবর্তীর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত ও অন্য কমরেডরা। বেলেঘাটায় দলের অফিসের সামনে বহু সাধারণ মানুষ ও দলের নেতা-কর্মীরা কমরেড অজয় চক্রবর্তীর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কেন্দ্রীয় অফিসে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী ও কমরেড মানব বেরা সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। ২৫ নভেম্বর ভারতসভা হলে তাঁর স্মরণসভা, বক্তা কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

কমরেড অজয় চক্রবর্তীর মৃত্যুতে দল একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠককে হারাল।

কমরেড অজয় চক্রবর্তী লাল সেলাম

মহান নভেম্বর বিপ্লব প্রমাণ করেছে

মজুর-চাষির সংঘবদ্ধ শক্তি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারে

(মহান নভেম্বর বিপ্লববার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৪ সালের ৮ নভেম্বর কলকাতার শহিদ মিনারে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের একটি অংশ প্রকাশ করা হল)

... নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু শিক্ষা রয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে, আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক না হলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও যেমন অতীতে হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতেও শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনগুলি বারবার ব্যর্থ হবে। যাঁরা বলেন, বিপ্লবের শক্তি এ দেশে নেই, বিপ্লব করবার মনপ্রাণ বা তেজ এ দেশে নেই, এ দেশের যুবকরা প্রাণ দিতে জানে না, লড়তে জানে না, এ দেশের চাষি-মজুর লড়তে এবং লড়াইয়ে সর্বস্ব দিতে জানে না— তাঁরা ইতিহাসকে অস্বীকার করেন। এ কথা সত্য নয়। এ দেশের চাষি-মজুর, খেটেখাওয়া মানুষ, অগণিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা এবং যুবকরা বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে, বিপ্লব করতে হবে'—শুধু এই স্লোগানটা কেউ যদি তুলে দিতে পেরেছে সময়মতো এবং তাদের শক্তি থেকেছে খানিকটা এই সমস্ত কর্মকাণ্ড গড়ে তোলবার, তা হলে বারবার দেশে দেখেছি লড়াইয়ের বন্যা এসেছে। শুধু 'বিপ্লব করতে হবে'—এই একটা কাল্পনিক ধারণাকে নিয়ে, শুধু এইটুকুকে সম্বল করে যুবকরা বারবার ময়দানে এসেছে, প্রাণ দিয়েছে, লড়েছে। কী বিপ্লব, কোথায় বিপ্লব, কী ভাবে হবে, কার নেতৃত্বে হবে, রাস্তা কী— এতসব কিছু নিয়ে তারা মাথাই ঘামায়নি।

কাজেই লড়তে চায় না আমাদের দেশের ছেলেরা, লড়তে চায় না চাষি-মজুররা— তারা রাশিয়ার শ্রমিকদের মতো, চিনের শ্রমিক-চাষির মতো, ভিয়েতনামের চাষিদের মতো লড়াকু নয়, মরণপণ করে তারা বিপ্লব করতে পারে না, কেউ যদি তাদের জন্য ফাঁকিতে বিপ্লব করে দেয় তা হলে তারা বিপ্লবটা চায়, না হলে তারা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়, তারা এত ঝঞ্ঝাট এবং লড়াই করতে চায় না— এসব কথাও ঠিক নয়। আসল গন্ডগোল হচ্ছে অন্য জায়গায়। আসল গন্ডগোলটা হচ্ছে, তারা পথ পায়নি, তাদের রাস্তা ঠিক হয়নি। আর রাস্তা যদি ঠিক না হয়— আন্দোলনের কলাকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি ধারণা সঠিক না থাকে— অর্থাৎ আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন এবং উদ্দেশ্য যদি ভ্রান্ত হয় তা হলে লড়াই করবার যত তেজ এবং কোরবানি করবার যত শক্তিই মানুষের থাকুক, সমস্ত আত্মত্যাগ এবং কোরবানি বিফলে যায়। শুধু কি এই আত্মত্যাগ এবং কোরবানি তখনকার মতই বিফলে যায়? না, এই বিফলতাকে কেন্দ্র করে নিরাশা এবং হতাশা জনমনকে ছেয়ে ফেলে। লড়াই এবং আন্দোলন করা সম্পর্কেই তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা ভাবতে থাকে, 'এই তো লড়লাম। এত প্রাণ দিলাম, এত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করলাম। কিন্তু তাতে কী হল?' বামপন্থী কর্মীদের তারা প্রশ্ন করতে শুরু করে, 'আন্দোলনে তো আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই তো হল না। এ দেশে কিছু হবে না। ও আপনাদের সকলকেই দেখা গেছে, আপনারা সব দল সমান। কোনও পার্টিকে দিয়ে কিছু হবে না।' এইরকম সব মনোভাবনা আন্দোলনের বিফলতাকে কেন্দ্র করে তাদের মনকে ছেয়ে ফেলতে থাকে।

এমনকি এর দ্বারা একটা সাধারণ কথা পর্যন্ত তারা গোলমাল করে ফেলে— যেটা বর্তমানে খুব প্রবল। এ বিষয়টা আমি একটু বলে নিতে চাই। তাদের কথায় আমি না হয় ধরেই নিলাম যে, আমাদের কারওর দ্বারাই কিছু হবে না। কিন্তু হবে না বলে কী করবেন? আমাদের সকলকে দেখে নেওয়া হয়েছে বলে কি এইভাবেই তাদের জীবনযাপন করা চলবে? না, চলতে পারবে? পেট মানবে? জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, চাকরির স্থিরতা নেই, জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সংসারে শান্তি নেই, স্নেহ-প্রীতি-মমতা সব উবে যাচ্ছে, চোখের সামনে ছেলেপিলেগুলো দিনের পর দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, নিজেরাও অমানুষ হয়ে যাচ্ছেন এবং তা যে যাচ্ছেন তাও তাঁরা নিজেরা টের পাচ্ছেন— তা হলে চলবে এভাবে? না, এ ভাবে বেশিদিন চলে না। তাই কী দেখা যায়? মাঝে মাঝে তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। আর মনুষ্যত্বের খেয়াল যদি কেউ নাও করে পেটের খেয়াল, দেহের খেয়াল তাদের করতেই হয়। কারণ পেট বড় বালাই। বুদ্ধি না থাকলে, রুচি-সংস্কৃতির পর্দা উঁচু না থাকলে মনুষ্যত্বের খেয়াল হয়তো অনেকেই করেন না। কিন্তু পেটের খেয়াল সকলকেই করতে হয়। ফলে মার খেয়ে আবার তাঁদের উঠে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে তখন আবার তাঁরা পাগলের মতন, না হয় বাচ্চা ছেলের মতন হাত-পা ছোঁড়েন। কারণ আন্দোলনগুলোর সামনে প্রয়োজনীয় সংগঠন কোথায়? সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোথায়? এইভাবে পাঁচ বছর, সাত বছর, আট বছর, দশ বছর বাদে-বাদেই দেশে এক-একটা লড়াইয়ের ঢেউ আসছে। আর এই প্রত্যেকটি লড়াইয়ে পরাজয়ের পর তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশা। মনে হচ্ছে কিছুই হবে না। সেই মানুষগুলোই কিছুদিন বাদে অস্থির হয়ে আবার একটা কিছু করার জন্য চারিদিক থেকে শোরগোল শুরু করেন। তা হলে লড়াই দরকার এবং লড়াইয়ের ময়দানে তাঁদের আসতেও হবে। আজ না এলে দু'বছর বাদে আসতে হবে, দু'বছর বাদে না এলে পাঁচ বছর বাদে আসতে হবে। কিন্তু এসে আবার সেই বাচ্চা ছেলের মতো তাঁরা লাফাবেন, যে কোনও একটা রাস্তা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং যে কোনও একটা স্লোগান আওড়াতে আওড়াতে তাঁরা মনে করবেন বিপ্লব করছেন এবং তার জন্য প্রাণ দেবেন। আবার মার খাবেন। আবার বিপথগামী হবেন। তাই প্রতিটি আন্দোলনের সামনে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মূল শিক্ষাটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। ...

এই রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান কথাটার মানে হচ্ছে, কমিটিগুলো গঠন করে সংগঠিতভাবে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে অজ্ঞ মজুর-চাষি লেখাপড়া না জানলেও অনেক কর্মক্ষমতা ও সংগঠন প্রতিভা—অর্থাৎ সংগঠন চালানো, নানা দিকে নজর দেওয়া প্রভৃতি বহু গুণের অধিকারী হয়ে স্তরে স্তরে গড়ে ওঠে। কাজেই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয় এবং সেই শক্তি পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারে। ফলে মজুর-চাষি রাষ্ট্রক্ষমতা চালাতে পারবে না—এই ধারণাটাও যে ভ্রান্ত, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ হয়ে গেল।

... আদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ভুল হলে কোনও একসময়ে যদি কেউ প্রচুর শক্তির অধিকারীও হয় শেষপর্যন্ত সেই শক্তি তার থাকবে না। এই 'আদর্শ' কথাটা আবার অনেক ব্যাপ্ত। আন্দোলনের নীতি-নৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতি সমস্ত প্রশ্ন এই আদর্শ কথাটার মধ্যে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের আন্দোলনের মধ্যে এই যে একটা ধারা চলেছে— আমরা লড়ব, স্লোগান দেব— কিন্তু আমাদের মুখে কোনও লাগামের দরকার নেই, রুচি-সংস্কৃতির দরকার নেই, শালীনতার সঙ্গে, ভদ্র আচার-আচরণের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কের দরকার নেই— এটা মারাত্মক ক্ষতি করছে। আন্দোলনের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের আচরণ করছেন তাঁরা মনে করছেন, আমাদের যেমন খুশি আমরা কথা বলব, বয়স্ক মানুষকে যেমন মনে করব গালাগালি করব, তাদের সঙ্গে যে কোনও ভাষায় কথা বলব, স্লোগান দিতে দিতে কোমর দুলিয়ে যা হয় অঙ্গভঙ্গি করব,— কিন্তু স্লোগানটা যখন বিপ্লবেরই দিচ্ছি তখন বিপ্লবটা হয়ে যাবে। তাদের মনে রাখা দরকার যে, তা হয় না, হতে পারে না। মানুষ খেতে পাচ্ছে না বলে স্লোগান দেখে হয়তো আন্দোলনে খানিকটা আসে, কিন্তু কোমর দোলা দেখে আতঙ্কিত হয়। আন্দোলনের কর্মীদের অশ্লীল কথাবার্তা শুনে আতঙ্কিতহয়। তাদের স্বার্থপরতা দেখে তারা কুঁকড়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই অবিশ্বাস এবং সংশয় দেখা দেয়।

... আজ অবস্থা যতই খারাপ হোক, একটা কথা আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে— যে কথাটা বুদ্ধিমান লোকদের, দ্বন্দ্বমূলক

আটের পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু মোকাবিলার দাবিতে বরানগর পৌরসভায় বিক্ষোভ

বরানগর পৌরসভার ৩৪টি ওয়ার্ডেই ডেঙ্গুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ম্যালেরিয়া। এর প্রতিকারের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র বরানগর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ নভেম্বর পৌরসভায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ সভায় দলের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে এত উন্নতির যুগেও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পৌরসভা ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি বছরই এই সময় ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে, এটা জানা সত্ত্বেও পৌরসভা আগাম ব্যবস্থা নেয়নি। অবিলম্বে পুরসভা জুড়ে লার্ভা দমনকারী স্প্রে বাড়াতে হবে, স্কুল-কলেজগুলোকে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া মশামুক্ত করতে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। এই বিষয়ে স্থানীয় ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

সম্পাদকের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল চেয়ারপার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং দাবিপত্র তাঁর হাতে তুলে দেয়।

চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের সড়ক অবরোধ

২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরতের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু কোনও সরকারই কথা রাখেনি। প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে ১৮ নভেম্বর ৬ দফা দাবিতে রাজ্য জুড়ে ১২টা থেকে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করা হয়। ৫১টি রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এজেন্টদের নিরাপত্তা, সিবিআই, ইডি, আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার প্রহসনে পরিণত হওয়া তদন্তগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে চালানো, অবিলম্বে স্ট্যাটাস পেপার প্রকাশ ও হাইকোর্ট গঠিত বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার কমিটির কাছে ও রাজ্য সরকারের কাছে গচ্ছিত অর্থ অবিলম্বে বিলি করার দাবি তোলা হয়। কিছু জেলায় আন্দোলনকারীদের পুলিশ-প্রশাসনের বাধার মুখে পড়তে হয়। অবরোধে শত শত ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী ও এজেন্ট অংশ নিয়েছেন।

চিটফান্ড তদন্তের মতোই নিয়োগ-দুর্নীতির তদন্ত মুখ থুবড়ে পড়া রহস্যজনক

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ পর্যন্ত সারদা কেলেঙ্কারি, নারদ কেলেঙ্কারি তদন্তের মতো পরিণতি হবে না তো! এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ বসু যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তার সাথে সম্পূর্ণ একমত চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই, ইডি এবং আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার তদন্ত ২০১৪ সাল থেকে শুরু হলেও এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার পরে এই সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি— যার সাথে সরকারে থাকা অতীতের এবং বর্তমানের বহু মন্ত্রী ও নেতা যুক্ত। তদন্তের গতি হারিয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক শক্তিগুলির খেলা। চাকরি দুর্নীতি এবং চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে এ রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ এবং প্রায় ১ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অথচ গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া রহস্যের জালে আটকে আছে। ৩ শতাধিক মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বিগত ৮ বছরে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। চিটফান্ডে প্রতারিত বিনিয়োগকারী ও এজেন্টদের সংগঠন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং চিটফান্ড কোম্পানিগুলি সহ ৫৪ জনকে পার্টি করে মামলা দায়ের করেছে।

বারোবিশায় দলীয় দফতর উদ্বোধন

১১ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকে উদ্বোধন হল এসইউসিআই(সি) দলের কুমারগ্রাম লোকাল কমিটির কার্যালয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন পলিটবুরো সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার এবং আলিপুরদুয়ার জেলা অফিস সম্পাদক কমরেড মৃণালকান্তি রায়। এরপর মহান নভেম্বর বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং একটি বিপ্লবী দলের পার্টি অফিসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাট ব্লকের দেনান দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্পের অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ, দেনান ও দেহাটি লকগেটের সমস্ত অকেজো সাটারের সংস্কার, জলনিকাশিতে বাধা সৃষ্টিকারী বেআইনি মাছের ঝিল তৈরি বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ ছ'দফা দাবিতে ১১ নভেম্বর কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বিডিও এবং সেচ দপ্তরে এসডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সভাপতি গোপাল সামন্ত, সহসম্পাদক গোবিন্দ পড়িয়া প্রমুখ। আধিকারিকগণ দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল
শহিদ বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস

আদিবাসী বনবাসী কৃষক বিদ্রোহ উলগুলানের মহান নায়ক শহিদ বিরসা মুন্ডার ১৪৮তম জন্মদিবস পালিত হল বাঁকুড়া জেলা সদর মাচানতলায়, শালতোড়া মজুরাকুন্দি জীবনদীপ বিদ্যানিকেতন আদিবাসী শিশুকিশোর বিদ্যালয়, সোনামুখী রথতলা, বাঁকুড়া আদিবাসী পাড়া শ্রীপল্লী প্রমুখ এলাকায়। মাচানতলায় শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন গৌতম মান্ডি। বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির কৃপাসিন্ধু কর্মকার।

জীবনদীপ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক জয়দেব মান্ডি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে বিরসা মুন্ডার জীবন সংগ্রাম আলোচনা করেন। শ্রীপল্লীতে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির পক্ষে হরিপদ সরেন। মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন কমিটির পক্ষে স্বপন নাগ। সোনামুখীতে শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ও স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা।

পূর্ব মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানোর প্রচেষ্টা বন্ধ, অতি দ্রুত বন্ধ ও খারাপ মিটার পাল্টানো, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, গৃহস্থ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ছাড়, কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের থেকে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা অবিলম্বে ফেরত প্রভৃতি ১৩ দফা দাবিতে ১১ নভেম্বর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

নেতৃত্ব দেন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সুনীল ঘোড়ই, প্রদীপ দাস, প্রণব মাইতি প্রমুখ। গেট অবরোধ করে গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখান।

নভেম্বর বিপ্লব আজও শোষণমুক্তির সংগ্রামে প্রেরণা

শিলিগুড়ির সভায় বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ও পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে সভা

মহারাষ্ট্রের পুনেতে বুকস্টল

১৯১৭-র ৭-১৭ নভেম্বর রাশিয়ার বুকে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী জার শাসনের অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ায়। বিশ্বে প্রথম শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠেছিল মহান লেনিনের নেতৃত্বে। তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধা স্ট্যালিনের অমূল্য অবদানে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল সমাজতন্ত্রের। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য সব দিক থেকে মহত্তম এক সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। আজও নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা জোগায় নভেম্বর বিপ্লব। পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে সাধারণ মানুষ নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করে, শপথ নেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক আন্দোলন গড়ে তোলার।

আগরতলা, ত্রিপুরা

সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় ৭-১৭ নভেম্বর এই 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' পালিত হয় যথাযথ মর্যাদা সহকারে। মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও স্মারক ব্যাজ পরানো হয়। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। নদীয়ার পলাশিপাড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর পলশুণ্ডা, দিঘিরধার বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। ৭-১৭ নভেম্বর বাঁকুড়া জেলা অফিস সহ লক্ষ্মণপুর, ধলডাঙা, সিমলাপাল, খাতড়া, শালতোড়া, সোনামুখী, চিঙানি প্রভৃতি এলাকায় পথসভা, বুক স্টল হয়। এ সংক্রান্ত আরও কিছু সংবাদ গত সংখ্যা গণদাবীতে প্রকাশিত হয়েছে।

দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদের সভা

ত্রিপুরা ঃ নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ নভেম্বর ত্রিপুরার আগরতলায় মিছিল এবং ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক।

দিল্লি ঃ দিল্লির জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সবরমতী ধাবায় ১৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর বিপ্লবের কারিগর লেনিন-স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, মহান মার্ক্সবাদী নেতাদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, বুক স্টল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এআইডিএসও-র দিল্লি রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শ্রেয়া বক্তব্য রাখেন।

কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। (ডানদিকে) হলে উপস্থিত শ্রোতারা

শিখছে না বিরাট সংখ্যক ছাত্র

একের পাতার পর

সালে অষ্টম এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান কমেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এনসিইআরটি পরিচালিত ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রতিটি ক্লাসে বেশিরভাগ পাঠ্যবিষয়েই ছাত্রছাত্রীদের ফল খারাপ হয়েছে। এই পরীক্ষা অনুসারে দশম শ্রেণির বিজ্ঞান পরীক্ষায় জেনারেল শ্রেণিভুক্ত (জাতিগত সংরক্ষণের আওতায় না থাকা) ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ৩৪ নম্বর কমেছে।

এসসি, এসটি, ওবিসি শ্রেণিভুক্তদের গড়ে কমেছে যথাক্রমে ৪৫, ৪৮ এবং ৪০ নম্বর। অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গড়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কমেছে ১৬ নম্বর। এসসি, এসটি এবং ওবিসি শ্রেণিভুক্তদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৭, ২৭ এবং ২৩ নম্বর করে গড়ে কমেছে। অষ্টম এবং দশম উভয় শ্রেণির ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান এই বিষয়গুলিতে একই ধরনের অবনমন চোখে পড়ছে। একমাত্র জেনারেল এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণির ভাষা ছাড়া সর্বত্রই এই অবনমন স্পষ্ট। অর্থাৎ ২০১৭-'১৮ সালের তুলনায় ২০২১-এ পাশের হার অনেকটা বাড়লেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়নি, বরং কমেছে।

ভারতে এমনিতেই চরম সংকটগ্রস্ত বুর্জোয়া অর্থনীতি করোনা মহামারির ধাক্কায় আরও সংকটগ্রস্ত হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাড়-জিরজিরে চেহারা যেমন আরও বেআব্রু হয়ে পড়েছে, ঠিক তেমনই সংকটের থাবা শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেও পড়েছে। সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল শিক্ষার কথা প্রচার করেছে। দীর্ঘ দুই বছর করোনা মহামারির জন্য ক্লাসরুম শিক্ষা বন্ধ রেখে ভার্চুয়াল মোডে পড়াশোনা চলেছে। যদিও তার সুযোগ নিতে পেরেছে ছাত্রছাত্রীদের ছোট একটি অংশই। সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে ব্লেন্ডেড মোডে অর্থাৎ ক্লাসরুম-ভিত্তিক শিক্ষাদানের সাথে কম্পিউটার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলছে।

সেই সঙ্গে পাশ-ফেল কার্যত তুলে দিয়ে, অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে ঢালাও পাশ করিয়ে শিক্ষার 'অগ্রগতির' মিথ্যা রিপোর্ট পরিবেশন করেছে তারা। এখন সরকারি সমীক্ষাই সরকারের প্রচারের সেই ঢাক ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরোধিতা করতে গিয়ে 'অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি' সহ দেশের শিক্ষাবিদেরা বারবার যে সত্য তুলে ধরছেন, সরকারি সংস্থার সমীক্ষার ফলেও তার সমর্থন মিললেই সরকার যে নীতি পরিবর্তন করবে এমন আশা করা বৃথা। কারণ সরকারি গদিতে যে দলই থাকুক না কেন, দেশের আসল পরিচালক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থায় মুনাফা লুটের জন্য তারা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার চেষ্টা করবেই। শিক্ষার এই অবনমন শিক্ষানীতিরই ফল। একে আটকাতে হলে জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতিকেই ছুঁড়ে ফেলতে হবে। প্রবর্তন করতে হবে জনমুখী শিক্ষানীতি।

‘আত্মনির্ভর’ না ‘যুদ্ধ-নির্ভর’ ভারত বানাতে চায় বিজেপি!

গুজরাটে বিধানসভা ভোট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন। তারই একটা অঙ্গ ছিল ১৮-২২ অক্টোবর গান্ধীনগরে ভারত সরকার আয়োজিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার ‘ডেফ এক্সপো-২০২২’। সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে চান। যুদ্ধাস্ত্রকে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করার মধ্যে ‘সদর্থক’ দিক দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা। এটাই নাকি ভারতের ‘আত্মনির্ভরতা’? বিজেপি প্রচার করছে, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার জেরেই অস্ত্র রপ্তানির অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে ভারত! উদ্দেশ্য, গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিরক্ষা শিল্পকে কেন্দ্র করে বেকার সমস্যায় জর্জরিত গুজরাটবাসীকে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের খোয়াব দেখিয়ে ভোটের বাজার গরম করা। একই সাথে অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনকেই দেশের শক্তি বলে তুলে ধরে মিথ্যা দেশপ্রেমের মোহে জনগণকে ফাঁসিয়ে দেওয়া। যাতে দেশ জুড়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান জনরোষকে কিছুটা চাপা দেওয়া যায়।

এই সেমিনারে ১৩০০ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিল্পপতিরাও ছিলেন। আসলে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসাই এখন ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিমালিকদের অন্যতম প্রধান ব্যবসা হয়ে উঠছে। বিগত পাঁচ বছরে ভারত থেকে প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় কোম্পানিগুলি ৭৫টি দেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল থেকে জুন) ভারত ১৩৮৭ কোটি টাকা মূল্যের প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ও সেই সংক্রান্ত প্রযুক্তি রপ্তানির পরিমাণ ২০২১-২২ আর্থিক বছরের সর্বাধিক ১২,৮১৫ কোটি টাকা স্পর্শ করেছে।

২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০৫৯ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই সেমিনারের উদ্দেশ্য তুলে ধরে জানিয়েছেন, ভারতকে তাঁরা অতি দ্রুত আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে ‘পথপ্রদর্শক’ করে তুলতে চান। এটাই নাকি ভারতের ‘গর্বের পথ’।

এ প্রসঙ্গে তিনি ‘নতুন বিশ্বে’ ভারতের যে বিশেষ ভূমিকার কথা বলেছেন, তা আসলে তথাকথিত একমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বাজারের নতুন ভাগবাঁটোয়ারার মধ্যে ভারতীয় পুঁজিপতিদের লাভ নেওয়ার কথাই বলতে চেয়েছেন। বর্তমানে আমেরিকা রাশিয়া চিন জাপান অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে ভারত সরকার ব্যালেন্সের খেলার মধ্য দিয়ে দেশীয় ধনকুবেরদের জন্য বিদেশের বাজার ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য কখনও চোখ রাঙানি, কখনও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে আফ্রিকা, এশিয়া এমনকি ইউরোপেরও বাজারের ভাগ পেতে চাইছে। তাই প্রতিরক্ষামন্ত্রী আফ্রিকার ৭৫টির বেশি দেশের এই সেমিনারে অংশগ্রহণে উচ্ছ্বসিত। প্রসঙ্গত, ২০১৮ তে ভারতে অনুষ্ঠিত এমনই একটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে আফ্রিকার ৫৩টি দেশ অংশ নিয়েছিল। আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করাই এখন ভারতের কাছে ‘নতুন দিগন্ত’।

আর এই দিগন্ত উন্মোচনে কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে? তারা প্রতিরক্ষা শিল্পে ৭৪ শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং সরকার প্রতিরক্ষা কারখানাগুলিতে ভারতীয় মালিকদের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগে ছাড়পত্র দিচ্ছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ২০২৫ সালের মধ্যে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎপাদন ও ৩৫ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম রপ্তানির কথা জানিয়েছেন। এ জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থেকেও বিনিয়োগের কথা জানিয়েছেন তিনি। বর্তমানে ৩০টি ভারতীয় প্রতিরক্ষা কোম্পানি অস্ত্র ও সরঞ্জাম রপ্তানি করছে ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার নানা দেশে। এই রপ্তানির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি, পাহারাদার জলযান, উন্নত হালকা হেলিকপ্টার, বুলেটপ্রুফ বর্ম, রেডিও সিস্টেম এবং রাডার সিস্টেম ইত্যাদি। উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীয় সরকার দুটি প্রতিরক্ষা করিডোর তৈরি করছে যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি বিনিয়োগ করবে বলে তাদের আশা।

কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে এই বিপুল বিনিয়োগ সাধারণ মানুষের কোন প্রয়োজন মেটাবে? এর মধ্য দিয়ে কি দেশের জনসাধারণের প্রয়োজনীয় যথার্থ ‘আত্মনির্ভরতা’, সমৃদ্ধি আসতে পারে? বেশি পরিসংখ্যানের দরকার নেই, দেশের যে কোনও মানুষই আজ স্বীকার করবেন, ভারতের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা আজ প্রায় নিঃশেষিত। পুঁজির শোষণে সাধারণ মানুষ আরও রিক্ত-নিঃস্ব হওয়ার পথে চলেছেন। ফলে ভারতের পুঁজিবাদী বাজারকে গ্রাস করেছে ভয়াবহ সঙ্কট। অথচ জনগণ যতই দুর্দশাগ্রস্ত হোক এই বিপুল জনসমষ্টির রক্ত চুষে এর মধ্যেই ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে উঠছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে যখন দেশে কোনও শিল্পেরই বাজার নেই তখন একচেটিয়া মালিকরা সরকারের সাহায্যে বিনিয়োগ করে চলেছে প্রতিরক্ষা এবং সামরিক ক্ষেত্রে। সরকারও সামরিক খাতে ক্রমাগত ব্যয় বাড়াচ্ছে, বাড়ছে সামরিক সরঞ্জামের উৎপাদন। দেশের মানুষের দেওয়া করের টাকায় গড়া সরকারি কোষাগারের অধিকাংশটা ঢেলে সরকার সামরিক খাতে খরচ বাড়াচ্ছে, যাতে একচেটিয়া মালিকদের মুনাফা ক্রমাগত বাড়তে পারে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বেশ কিছু সময় আগে থেকেই বিশ্বের নানা দেশে পুঁজি রপ্তানি করছে। এর মধ্য দিয়ে ভারত একটি অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা তাদের মুনাফা অটুট রাখতে এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে ছাপিয়ে গিয়ে নিজেরাই অস্ত্র উৎপাদনে নামতে চাইছে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারই এর ক্রেতা, তাই ব্যবসায় মন্দার সুযোগ কম। একইসাথে এর মাধ্যমে তারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতায় নিজেদের জায়গা করে নিতে রাষ্ট্রীয় সামরিক তাকত বাড়ানোর কাজে ঝাঁপাচ্ছে। অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিই হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ। যাকে বলা হয় অর্থনীতির সামরিকীকরণ। বিশ্বের সমস্ত

সাতের পাতায় দেখুন

দেশে হাজার হাজার কৃষক আত্মঘাতী, কোনও সরকারই বাঁচানোর দায়িত্ব নেয় না

২০২১-এ ভারতে কৃষির সঙ্গে যুক্ত ১০,৮৮১ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। এদের মধ্যে ৫,৩১৮ জন কৃষক ও ৫,৫৬৩ জন কৃষি শ্রমিক। এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুরো (এনসিআরবি)। যদিও আসল সংখ্যাটা আরও বেশি। কারণ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা সহ ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কৃষির বিপর্যয়ের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা আলাদা করে রেকর্ড করা হয় না। এই জায়গাগুলিতে কৃষক, খেতমজুর, ভাগচাষিরা আত্মহত্যা করলেও তাকে প্রশাসন পারিবারিক বিবাদ, নেশায় আসক্তি বা অসুস্থতা জনিত হতাশার কারণে আত্মহত্যা হিসাবে দেখায়। তাই তাদের তালিকায় আত্মঘাতী কৃষক ও ভাগচাষির সংখ্যা শূন্য। রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ২০২১ সালেই কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন সবচেয়ে বেশি।

এই পরিসংখ্যানে দেশের বিবেকবান সাধারণ মানুষ মাত্রেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেও প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ভাবলেশহীন। তিনি এবং তাঁর দল বিজেপি একদিকে অমৃত মহোৎসবের নামে বিভিন্ন শিলান্যাস, বাণী বিতরণ, জৌলুসপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে ‘প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মাননিধি যোজনা’য় কত মানুষ টাকা পাচ্ছে তার সাড়ম্বর ঢাক পেটানোর পর তাদের আর সময় কই কৃষকদের বাঁচা-মরার খবর রাখার? যে বিশাল কৃষক সমাজ দেশের মানুষের অন্ন যোগান দেয়, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে খাদ্যশস্য ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে তাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালা-যন্ত্রণার খবর নেওয়ার সময় মন্ত্রী, আমলা, সরকারি নেতাদের নেই। এই দরিদ্র মানুষগুলির দুবেলা খাবার জোটে কি না, এদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ কতটুকু পায়, এদের চিকিৎসার সুযোগ আছে কিনা বা চাষের সময় নেওয়া ঋণ চাষিরা শোধ করতে পারল কিনা, উৎপাদিত ফসলের লাভজনক দাম চাষিরা পেল কিনা— সরকারি কর্তারা চান এসব সত্য যেন চাপাই থাকে। না হলে প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারতের ফানুস ফেটে যাবে।

রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে, কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের আত্মহত্যার ৮০ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে ২০২১ সালে আত্মঘাতী হয়েছেন ৪০৬৪ জন কৃষক। এদের বেশিরভাগই নিজের জমিতে ফসল ফলাতেন এবং বাকিরা হয় ভাগচাষি বা কৃষিশ্রমিক। দেশে প্রতিদিন অন্তত ১৫ জন করে কৃষক ও ১৫ জন কৃষিশ্রমিক বা ভাগচাষি আত্মঘাতী হওয়ার বিষয়টিও সামনে এসেছে রিপোর্টের মধ্য দিয়ে। এই চিত্র দেশের কেমন উন্নয়ন বা আত্মনির্ভরতার নিদর্শন তার উত্তর নিশ্চয়ই বিজেপি নেতারা দেবেন না। দেশের কিছু কৃষককে বছরে ৬০০০ টাকা খয়রাতি করে যে কৃষক পরিবারগুলিকে বাঁচানো সম্ভব নয়, তা তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, বহু রাজ্যে প্রাপকদের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে, কারণ সরকার বরাদ্দ কমাচ্ছে। এও তো অজানা নয় যে, বেশিরভাগ চাষি জমিতে চাষ করার জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হয় চড়া সুদে। উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে যে টাকা সে পায় তাতে তার চাষের খরচ ওঠে না। সুদ সহ ঋণের মোটা টাকা সে পরিশোধ করতে পারে না। কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেও ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থায় চাষিকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল বিক্রির নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র সরকার ও তার প্রশাসন।

দেশে এতদিন আইন থাকলেও কোনও সরকারই চাষিকে ফসল বিক্রি করে ন্যায্য দাম পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। সব সরকারই পরিচালিত হয়েছে কালোবাজারি, মজুতদার ও পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে। তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের জয় কিছুটা হলেও অর্জিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সত্যিই কৃষকদরদি হত, তবে কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পায়, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, সার, কৃষি সরঞ্জাম, বীজ, কীটনাশক এবং সেচ ব্যবস্থা যাতে সুলভ হয় তার ব্যবস্থা করত। এসবের কোনও ব্যবস্থা তারা করেনি। আড়তদার ও মজুতদারদের যে রমরমা কালোবাজারি দেশ জুড়ে চলছে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা সরকার নেয়নি। শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে কিছু কৃষকের হাতে সামান্য খয়রাতি তুলে দিয়ে ফলাও করে তার প্রচার করার ব্যবস্থা করেছে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। ফসলের দাম না পেয়ে বা কৃষি শ্রমিকরা সারা বছর কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের আত্মঘাতী হওয়া থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হতে পারে দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের একচেটিয়া পুঁজির তোষণ নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভ্রান্ত কৃষিনীতিকে রুখে দিতে সংগঠিত হওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।

স্কিড রো-কে ঢেকে রেখেও নিজেদের প্রকৃত চেহারা আড়াল করতে পারছে না মার্কিন শাসকরা

‘পুঁজিবাদী দুনিয়ার ইঞ্জিন’ আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষের একটা বাস্তব কাহিনী শোনা যাক, যে কাহিনি শুধু মার্কিন দেশের ধনতান্ত্রিক ‘অগ্রগতি’র প্রকৃত চেহারাকেই তুলে ধরে না, গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ারই ছবি যেন তাতে ফুটে ওঠে।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শহরের কেন্দ্রস্থলে সিটি সেন্টার থেকে মাত্র তিন মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত স্কিড রো। যাকে আড়াল করার জন্য সে দেশের সরকার থেকে ‘উন্নয়নের ভগীরথ’ ধনকুবেররা— সবার চেষ্টার শেষ নেই। আমেরিকার সবচেয়ে বেশি বিলিওনেয়ারের বাস এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই। আর সেখানকারই প্রধান শহরের কেন্দ্রস্থলের একেবারে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে স্কিড রো হল বহুতল বাড়ি দিয়ে পরিবৃত একটি অঞ্চল, যা সহজে নজরে পড়ে না। সেখানকার রাস্তাগুলিতে অস্থায়ী তাঁবু, ত্রিপল, ছোট ছোট ছাউনি, বাতিল গাড়িতে বসবাস করেন প্রায় ৬ হাজার আশ্রয়হীন মানুষ। অল্প কিছু শৌচালয় ছাড়া কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই। সাফাই কর্মীরা ওই অঞ্চল ভুলেও মাড়ান না। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ যতটা নিম্নমানের হওয়ার তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী এলাকার ডাস্টবিন থেকে খাদ্য ও ব্যবহার্য নানা জিনিস সংগ্রহ করেন এখানকার বাসিন্দারা। তা থেকেও এদের বঞ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন নোংরা ফেলার পাত্রগুলি অনেক সময় তালা বন্ধ করে রেখে দেয়। এখানকার বাসিন্দাদের আয়ু খুব বেশি হলে ৪৮ বছর, যা মার্কিন নাগরিকদের গড় আয়ুর থেকে ২০ বছর কম।

১৮৫০ নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার অংশ হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার সময় থেকে স্কিড রো-র কাহিনি শুরু। সোনা এবং কাজের সন্ধানে মানুষ পূর্ব থেকে পশ্চিমের এই অঞ্চলে ছুটে এসেছিল। কিন্তু বহুজনের স্বপ্নভঙ্গ হয়, বেকার ও আশ্রয়হীন অবস্থায় অবশেষে তারা স্কিড রো-তে বসবাস করতে বাধ্য হন। ধনী প্রতিবেশীদের কাছে এই আশ্রয়হীন মানুষরা অস্পৃশ্য। ১৯৭০ সালে নগর-কর্তারা এখানকার বাসিন্দাদের বাকি শহরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সীমারেখা টেনে দেয়। বহু পুরনো বাড়ি ধসিয়ে নতুন বহুতল তৈরি করে। তারা বুলডোজার দিয়ে স্কিড রো-কে গুঁড়িয়ে দেওয়ারও পরিকল্পনা করে, কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের বাধায় তা ভেস্তে যায়। স্কিড রো-র বাসিন্দারা হুঁশিয়ারি দেয়, একটা স্কিড রো ভেঙে দিলে লস এঞ্জেলেসে আরও অসংখ্য স্কিড রো তৈরি হবে। কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলকে কনটেনমেন্ট জোন হিসাবে সীমাবদ্ধ করে, যাতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গগনচুম্বী প্রাসাদ তৈরিতে অসুবিধা না হয়। তারা স্কিড রো-তেই কিছু শৌচালয় এবং রাস্তার ধারে বসার বেঞ্চ বানিয়ে দেয়, যাতে ‘অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা’ একটা এলাকাতেই আটকে থাকে।

এইভাবে স্কিড রো-র অসহায় মানুষদের ‘অবাঞ্ছিত’ করে দেয় গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন সরকার। তারা স্কিড রো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা জেলের মতো তীব্র আলোয় ভরিয়ে রাখে। ডাস্টবিনগুলির তালা বন্ধ করে রাখে, যাতে সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করতে না পারে এখানকার বাসিন্দারা। অথচ অভুক্তদের খাবার দেওয়ার কোনও ঘোষণা সরকার করেনি। আশ্রয়হীনদের জন্য এক অঘোষিত বিচ্ছিন্ন অঞ্চল! ১৯৯০ সালে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা তহবিল ফুরিয়ে গেলে হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়াম থেকে তাদের এই অঞ্চলে এনে রাখা হয়, তাদের পক্ষে সেটা মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর জানা সত্ত্বেও। পুলিশ প্রায়ই এখানে টহল দেয়। বাসিন্দারা সবসময়ই উচ্ছেদের ভয়ে থাকে। কনটেনমেন্ট জোন করে রাখা এবং কাজহীন, আশ্রয়হীন মানুষদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার পরিকল্পনা— এক শহরের আলোর রোশনাই ঢেকে দেয় তারই মধ্যে থাকা আরেকটা শহরকে। এই নেই হয়ে থাকা শহরের বাসিন্দাদের বেকারি, বাসস্থানের অভাব, মানসিক অবসাদ, ড্রাগে আসক্তি— এই সব প্রকৃত সমস্যার দিকে কখনও দৃষ্টি দেয় না শাসকরা। করোনা অতিমারি এবং অর্থনৈতিক সংকট, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে করে তুলেছে আরও দুর্বিষহ।

অবশ্য স্কিড রো একা নয়। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির দেখা আমেরিকার বহু শহরেই মিলবে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০-তে আমেরিকার ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৬৬ জন মানুষ আশ্রয়হীন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। দেশের সবচেয়ে ধনী তিনটি রাজ্য— ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক এবং ফ্লোরিডায় সবচেয়ে বেশি মানুষ আশ্রয়হীন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যে আশ্রয়হীন মানুষের সংখ্যা মারাত্মক হারে বেড়ে চলেছে। ওই পত্রিকার রিপোর্ট— গত কয়েক মাসে আমেরিকায় এই সংখ্যা দ্বিগুণ, তিনগুণ হারে বেড়েছে। ১৯৮৬ সালের পর থেকে ঘরভাড়া বেড়েছে অত্যন্ত দ্রুতহারে ফলে সামান্য দিনমজুরি করে, ছোটখাট কাজ করে যারা পেট চালান তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। অতিমারির পরে ৭০ লক্ষ নিম্ন আয়ের মানুষ ঘর ভাড়া দিতে পারছেন না। উচ্চশিক্ষিত বহু মানুষও ঘরভাড়া দিতে না পেরে গাড়িতেই দিন কাটাতে বাধ্য হন।

আফ্রিকান-আমেরিকান ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে গৃহহীনের সংখ্যা সাদা চামড়া এবং এশিয়ানদের তুলনায় অনেক বেশি। তাঁরা কিন্তু অকর্মণ্য নন, বরং কর্মদক্ষ। কাঠের কাজ, জলের পাইপের কাজ ও অন্যান্য নানা টেকনিক্যাল কাজে তাঁদের ডাক পড়ে উচ্চবিত্তের ঘরে। আশ্রয়হীনদের সাথে অবসরপ্রাপ্তরা যুক্ত হওয়ায় এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। তারা কর দিয়ে এবং কাজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল দেশকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। আশা ছিল তাঁরাও উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা পাবেন। উদারিকরণের যুগে সে সুরক্ষা প্রায় নেই। কেউ কেউ নামমাত্র সুরক্ষা ভাতা পান। ‘দেশের জন্য’ যাঁরা যুদ্ধ করেছেন, সেই অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদেরও ১১ শতাংশ আশ্রয়হীন। ৪০ থেকে ৬০ হাজার এমন সৈনিকের কোনও আশ্রয় নেই। এদের অর্ধেকের বয়স ৫১ বছরের উপরে অর্থাৎ নতুন কোনও কাজ তাঁরা পাবেন না। বেকার, অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক, সৈনিক, যুবক সহ বহু পেশার সাথে যুক্ত নাগরিকরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাস্তায় জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

রাস্তায় দিন কাটানোর ফলে মানসিক অবসাদ ও নানা অনিশ্চয়তায় ভুগে অনেকে ড্রাগ-আসক্ত হয়ে পড়ে। তাদের এর থেকে মুক্ত করার বদলে সরকার এটাকেই প্রচারের হাতিয়ার করে সকল আশ্রয়হীন মানুষকেই আরও প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়। নাক উঁচু উচ্চবিত্ত এবং বড় বড় সংবাদমাধ্যমের ঠাণ্ডা ঘরে বসা সাংবাদিকদের দিয়ে প্রচার তোলা হয় এই আশ্রয়হীনদের জন্য প্রয়োজনীয় আশ্রয়স্থল সরকার করে দিয়েছে। তবু রাস্তায় থাকা এদের যেন একটা সখ! বাস্তব হচ্ছে, এই শেল্টার হোমগুলিতে থাকতে চেয়ে ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে বসে থাকেন যাঁরা, একেকটা হোমেই তাঁদের সংখ্যাটা হাজার জনের বেশি হয়ে যায় প্রতি রাতে। সরকারি প্রচার, এরা কাজ করতে চায় না। কিন্তু বাস্তব হল, এরা দক্ষ এবং কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কোনও কাজ তারা পায়নি। তাদের কোনও ঠিকানা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় এই সমস্যা বেড়েছে বহু গুণ।

২০০৮-এ মার্কিন অর্থনীতিতে ভয়াবহ মন্দার পর বিশেষজ্ঞরা বহু দাওয়াই বাতলে বলেছিলেন, এবার ঘুরে দাঁড়াবে মার্কিন তথা বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি। বাস্তবটা কি তা ওই একটুখানি রাস্তা স্কিড রো-ই দেখিয়ে দিচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে। এই পুঁজিবাদের অনিবার্য সংকট থেকে রেহাই নেই কারও। তাই ভয়াবহ ধনবৈষম্যে যেমন ভুগছে দরিদ্রতম দেশ তেমনই সে রোগের দগদগে ঘা আস্তে আস্তে গ্রাস করছে মার্কিন দেশকেও। অট্টালিকার পুলটিশ দিয়ে স্কিড রোয়ের ঘা কতদিন ঢেকে রাখবে মার্কিন শাসকরা? পারবে ততদিন যতদিন ওই আশ্রয়হীন মানুষগুলির মতো কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের থেকে সমাজবদলের প্রকৃত রাস্তাটাকে ওরা আড়াল করতে পারবে। তবে সেটাও চিরকাল পারবে না।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই সি-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার খাকুড়দা লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল চন্দ্র নস্কর ১৩ নভেম্বর শান্তি পুর গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। দলের সমস্ত গণআন্দোলনের কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিতেন। প্রাইমারি শিক্ষকতা করার সময় তিনি বিপিটিএ-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

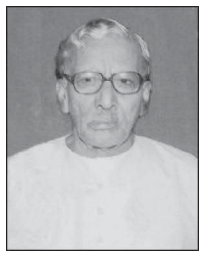

১৯৭৯ সালে সিপিএম সরকারের আমলে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। মানুষের যে কোনও সমস্যায় তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে এলাকার গরিব মানুষদের চিকিৎসা করে সাহায্য করতেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে এলাকার বহু গুণমুগ্ধ মানুষ দলীয় অফিসে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গোপাল সাহু সহ লোকাল কমিটির সদস্যরা ও বহু সাধারণ মানুষ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড অনিল নস্কর লাল সেলাম

‘যুদ্ধ নির্ভর’ ভারত বানাতে চায় বিজেপি সরকার

ছয়ের পাতার পর

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশই এইভাবে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করার পথে যাচ্ছে।

‘সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়’, মহান লেনিনের এই শিক্ষা যে কত বড় সত্য আজকের দুনিয়ার পরিস্থিতি তা আবার প্রমাণ করছে। মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে মহান স্ট্যালিন এবং পরবর্তীকালে মহান নেতা শিবদাস ঘোষ আরও সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন, বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সামনে আজ বেঁচে থাকার একটাই রাস্তা খোলা আছে, তা হল, অর্থনীতির সামগ্রিক সামরিকীকরণ। এই কারণেই আজ ক্রমাগত যুদ্ধ বাধানো অথবা যুদ্ধ উত্তেজনা জিইয়ে রাখা তাদের অতি প্রয়োজন। না হলে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসা জমবে না। একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সেবদাস হিসাবে সমস্ত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারের মতোই ভারতে বর্তমান বিজেপি সরকারও এই দায়িত্ব পালনে মনোযোগী। এই প্রতিরক্ষা শিল্পে তারা কিছু কর্মসংস্থানের খোয়াব দেখাচ্ছে। এমনিতেই প্রতিরক্ষা শিল্প এখন অতি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। ফলে কর্মসংস্থান বিশেষ কিছু হওয়ার নয়, কিন্তু যদি হয়ও, তা হলেও কি তা দেশের মানুষের মূল প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে? এর জন্য যে যুদ্ধ-উত্তেজনা, সন্ত্রাসবাদের ভূতকে সরকার মদত দিয়ে চলে তাতে প্রাণ যায় কার? হয় দেশের নিরীহ সাধারণ মানুষের না হয় দরিদ্র ঘর থেকে চাকরি করতে আসা কোনও সৈনিক-জওয়ানের। আর এটাকেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে সরকার প্রচারের ঝড় তুলে সামরিক ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগের গল্প শোনায়।

এর ফলে একচেটিয়া মালিকদের বিপুল মুনাফা হয়। কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে এই পথই নিয়েছে বিজেপি সরকার। আত্মনির্ভর নয় ওদের চোখে ভারত হবে যুদ্ধ-নির্ভর, যেখানে ক্ষুধার্ত অপুষ্ট শিশু অবাক চোখে দেখবে রাইফেল, যুদ্ধ বিমান, কামানের ঝলক, কিন্তু তার পেট রয়ে যাবে খালি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মেলনে স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার শপথ

১২-১৩ নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরের রবীন্দ্র মঞ্চে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নবম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। শুরুতে জরুরি সময়ে জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা (বেসিক লাইফ সাপোর্ট), ডায়াবেটিস রোগীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন (লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন ইন ডায়াবেটিস), ওরাল হাইজিন অ্যান্ড ওরাল হেলথ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। 'আঞ্চলিক ভাষায় মেডিকেল শিক্ষা— একটি ছদ্মবেশী আক্রমণ' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন হয়।

সহ-সভাপতি ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন। স্বাস্থ্যের উপর চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সম্মেলনের সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের নিউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী। সম্মেলনের স্মরণিকা উদ্বোধন করেন রাজ্য সহ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ সিস্টার প্রীতি তারণ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ওড়িশা রাজ্য সভাপতি ডাঃ সুরজিৎ সাহু, ডাঃ উদয় নারায়ণ সরকার, ডাঃ পার্থসারথি মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা প্রমুখ।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মেলনের মূল আবেদন তুলে ধরেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও মেডিকেল-নার্সিং-প্যারামেডিকেল শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ বেসরকারিকরণের আক্রমণের বিরুদ্ধেস্বাস্থ্য-শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে সংগঠনের বর্ষব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র। 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্বাস্থ্যের সার্বিক বেহাল অবস্থা' শীর্ষক আলোচনা করেন রাজ্য যুগ্ম-সম্পাদক এবং সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র। প্রতিনিধিরা তাতে নানা সংযোজন করেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। ৪০ জনের বেশি প্রতিনিধি সমর্থন, সংশোধন ও সংযোজনে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলন থেকে অধ্যাপক উদয় নারায়ণ সরকারকে সভাপতি ও ডাঃ বিপ্লব চন্দ্রকে সম্পাদক করে ৭০ জনের রাজ্য কমিটি ও ৪৫ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত সমাপ্তি বক্তব্যে বর্তমান চূড়ান্ত অবক্ষয়ী সাংস্কৃতিক পরিবেশে সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে বিপন্ন মানুষের স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার দাবিতে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার জন্য অভিনন্দন জানান।

বাঙ্গালোর বাঁচাও কমিটির বিক্ষোভ

বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকের রাজধানী বাঙ্গালোরের অবস্থা শোচনীয়। রাস্তাঘাট খানাখন্দে ভরা। দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু প্রায়ই ঘটে চলেছে, জলনিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, পৌরকর্তারা দুর্নীতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। এই অবস্থায় নাগরিকরা সমস্যা সমাধানের দাবিতে গড়ে তুলেছেন 'সেভ বাঙ্গালোর কমিটি'। ১৭ নভেম্বর এই কমিটি পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। বক্তব্য রাখেন কমিটির আহ্বায়ক এন রবি।

মহান নভেম্বর বিপ্লব

তিনের পাতার পর

বস্তুবাদীদের বা বিজ্ঞান সাধকদের কেবলমাত্র জানা ছিল এবং মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারত না। তারা ভাবত, প্রতিক্রিয়াশীলদের, বুর্জোয়াদের এই যে জগদ্দল পাথরের মতো বিরাট রাষ্ট্রশক্তি— যার এত মিলিটারি, এত ক্ষমতা, এত টাকা-পয়সা— তার বিরুদ্ধে কি নিরন্ন, অজ্ঞ, নিরক্ষর জনসাধারণ কখনও সংঘবদ্ধ হয়ে এমন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারে বা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব, যার ফলে সেই শক্তি ভেঙে পড়বে এবং বিপ্লব সফল হবে? নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ায় প্রথম এই কথাটাকে আর তত্ত্বে না বুঝিয়ে বাস্তবে প্রমাণ করে দিয়ে গেল— হ্যাঁ সম্ভব।

... রাশিয়ার অজ্ঞ মজুর-চাষি বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে একদল আমলাকেও তাদের অধীনে আনতে সক্ষম হল। কারণ তাদের বিপ্লবটা ভোটের মারফত ক্ষমতা দখল ছিল না, বা শুধু মিটিং-প্রসেশন করে কিছু লাঠালাঠি করা বা ঢিল-পাটকেল ছোঁড়াও ছিল না। তাদের বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটানোর মাধ্যমে। এই রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান কথাটার মানে হচ্ছে, কমিটিগুলো গঠন করে সংগঠিতভাবে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে অজ্ঞ মজুর-চাষি লেখাপড়া না জানলেও অনেক কর্মক্ষমতা ও সংগঠন প্রতিভা— অর্থাৎ সংগঠন চালানো, নানা দিকে নজর দেওয়া প্রভৃতি বহু গুণের অধিকারী হয়ে স্তরে স্তরে গড়ে ওঠে। কাজেই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয় এবং সেই শক্তি পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারে। ফলে মজুর-চাষি রাষ্ট্রক্ষমতা চালাতে পারবে না— এই ধারণাটাও যে ভ্রান্ত, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের, চিনের, ভিয়েতনামের মজুর-চাষিরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য এগিয়ে চলল।

নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষাগুলো মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়ারা শক্তিশালী বলে, তাদের হাতে প্রবল রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে বলে চিরকাল তারা জগদ্দল পাথরের মতনই আমাদের ঘাড়ের উপর বসে থাকবে— এমন ঘটলে বুর্জোয়াদের হয়ত ভাল হত এবং এ ভেবে তারা খুশিও হতে পারে, কিন্তু এরকম ঘটে না। তবে এই পরিবর্তন কতদিনে ঘটবে, এটা নির্ভর করছে আপনাদের ওপর।

যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ এবং লাইন গ্রহণ করে, যথার্থ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে স্তরে স্তরে গণআন্দোলনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনার মারফত জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান, অর্থাৎ সোভিয়েটের মতন বিপ্লবী কাউন্সিল এবং গণকমিটিগুলো গড়ে তুলতে কতদিন আপনারা নেবেন তার ওপর নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি বিপ্লব হবে। আপনারা মনে রাখবেন, এ কাজ ফাঁকি দিয়ে হবে না, মাঠে-ঘাটে শুধু চিৎকার করেও হবে না বা ভোটের বাক্সে কেরামতি-কারসাজি দেখিয়েও হবে না। বিপ্লব তখনই আপনারা করতে সক্ষম হবেন যখন সঠিক মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শের ভিত্তিতে এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম আপনারা দিতে পারবেন। ভোটেও যে আপনারা লড়েন এবং অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেগুলো আপনারা গড়ে তোলেন— সেগুলোকেও এই অর্থে লড়াই হিসাবে যদি আপনারা দেখেন এবং মূল বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক অর্থে সেগুলোকে গড়ে তুলতে পারেন— তবেই মনে রাখবেন, এগুলোর সার্থকতা আছে। তা ছাড়া এক ইঞ্চিও বেশি এর কার্যকারিতা নেই। আর, এইটা যদি আপনারা ধরতে সক্ষম হন তা হলে সাথে সাথে এটাও আপনাদের বুঝতে হবে, যে গণআন্দোলনগুলো আপনারা গড়ে তুলছেন এর আগে যাওয়া আছে, পিছু হঠা আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে, মার খাওয়া আছে— কারণ এর আঁকাবাঁকা পথ আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, এই গণআন্দোলনগুলোর আদর্শ, নীতি, মূল রাজনৈতিক লাইন, বিপ্লবের স্তর নির্ণয় আপনারা ঠিক করেছেন কি না— অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের জায়গায় বুর্জোয়াশ্রেণি যে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন এবং এই বুর্জোয়াশ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করাই যে বিপ্লবের প্রধান কার্যক্রম— এটা আপনারা ধরতে সক্ষম হয়েছেন কি না।

বাঙ্গালোরে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন

বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকের বাঙ্গালোর ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিয়েছে— বিদ্যুৎ গ্রাহকরা যদি টানা তিন মাস বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে না পারেন, তা হলে তারা ডিফল্টার হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। কোম্পানি বলেছে, নতুন কানেকশন নিতে গেলে শুরু থেকে সমস্ত খরচ নিজেকে বহন করতে হবে ডিফল্টার (খেলাপি) গ্রাহককে। কর্ণাটক ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছে, কোম্পানির এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুতের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবে।

অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ভি জ্ঞানমূর্তি ১৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বছরের পর বছর, রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন বিজেপি, জেডিএস সহ সব সরকারগুলিই শিল্প-পুঁজিপতি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বকেয়া হাজার হাজার কোটি টাকার ইলেকট্রিক বিল অনাদায়ী রেখে দিয়েছে। সেই বকেয়া বাঙ্গালোর ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি সাধারণ মানুষের পকেট কেটে আদায় করার ফন্দি করেছে। ফলে, ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারিতে জর্জরিত মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেণি বিদ্যুৎ বিল মেটাতে পারছে না। কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন এই জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরোধিতা করে বলেছে, এই সিদ্ধান্ত সুকৌশলে বেসরকারিকরণের দুরভিসন্ধি। কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন ব্যাঙ্গালোরের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাগরিক কমিটি গড়ে তুলে এই জনবিরোধী পদক্ষেপকে রোখার ডাক দিয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com